ঔপনিবেশিক বাংলায় মাতৃত্ব
(১৮৮০ – ১৯১৪)

নূপুর দত্ত

সারসংক্ষেপ: ভদ্র হিন্দু পরিবারের কন্যারা "গৃহস্থ বাড়ির মেয়ে" নামেই অধিক পরিচিত। বিবাহ ছিল তাদের জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বিবাহের মাধ্যমে তারা স্বামীর ঘরে ও সমাজে নতুন পদমর্যাদা লাভ করতেন। বাইরের জগতের সাথে তাদের প্রায় কোন সংযোগ ছিল না। তাদের জীবন অন্দরমহলের চারিদিকে আবর্তিত হোত।বিবাহের পরবর্তীকালে সন্তানের জন্ম হলে নারীর পদমর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেত। বিশেষ করে যদি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করত তবে নারীরা সংসারে সর্বোচ্চ পদমর্যাদা লাভ করতেন। ছেলের জন্ম হলে নারী হতেন 'খোকার মা'। সুতরাং একজন স্ত্রীর থেকে 'খোকার মা'-র মর্যাদা অনেক বেশি ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন জাগে যে 'নারীরা কি সত্যিই ঘরের দেওয়ালের মধ্যে সুরক্ষিত ছিলেন' ?

যে সব নোংরা পরিবেশে তারা সন্তানের জন্ম দিতেন তা ছিল নরকের নামান্তর। এই সামাজিক সমস্যা ব্রিটিশদের সামনে এলে তারা তাদের বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে আলোচনা করতে শুরু করেন। নারীদের এই দুর্ভোগের কাহিনী সমসাময়িক পত্রপত্রিকা গুলোতেও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই আলোচনার মাধ্যমে নারীদের সেই সব দুর্ভাগ্যজনক দিনগুলি বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কালে গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজননে সহায়িকা ধাইদের সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমসাময়িক সাহিত্য থেকে এ বিষয়ের সম্পর্কিত উদাহরণ নেওয়া হয়েছে। এই ভাবে এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে অন্দরমহলের একটা প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

মূলশব্দাবলী : নারী, মাতৃত্ব, সন্তানপ্রসব, দাইমা, সমকালীন সাহিত্য।

মাতৃত্ব এক অদ্ভুত অনুভূতি। একজন নারী সন্তানের জন্মদানের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। মাতৃত্ব নারীকে নবজন্ম প্রদান করে। এই পরিবর্তন যুগে যুগে নারীজীবনে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু স্বাভাবিক ও স্বেচ্ছায় মাতৃত্ব এবং সামাজিক পরিস্থিতির ফলে চাপিয়ে দেওয়া মাতৃত্ব – এই দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ আছে। আজকের যুগে নারীরা স্বেচ্ছায়, স্বাভাবিকভাবে মাতৃত্ব অর্জন করতে পারে। কিন্তু উনবিংশ শতকে মাতৃত্ব ছিল সামাজিক পরিস্থিতি এবং প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এর মূল কারণ ছিল জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞানতা এবং বাল্যবিবাহ।

এই সময় সামাজিক প্রথা বাল্যবিবাহকে শ্রেণীনির্বিশেষে বাধ্যতামূলক করেছিল। তখনো গৌরীদানকে পুন্যকর্ম বলে মনে করা হতো। মনু বলে গেছেন। 'অষ্টবর্ষা ভবেদ গৌরী নববর্ষে তু রোহিনী'– অর্থাৎ অষ্টমবর্ষের কন্যা গৌরীর সমতুল্য, তাই ওই বয়সেই কন্যাদান করা গৃহস্থের পক্ষে মঙ্গলজনক। এর ফলে কন্যা সন্তানের আত্মার সংস্কার ও পূর্ণ বিকাশ হয়। (মুখোপাধ্যায় ২০১১) আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের মূল চরিত্র সত্যবতীর খুব অল্প বয়সে বিবাহ হয়েছিল । তাই সে বিবাহের পরেও পিতৃগৃহে বাস করত। যখন যৌবন আসার আগেই তাকে শ্বশুর বাড়িতে ডেকে পাঠানো হয়, পিতা রামকালী চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'এই আবোধ মেয়ে একে এক্ষুনি শ্বশুরবাড়ি পাঠানো চলে? অসম্ভব' ('দেবী' ১৩৭১)।

সুতরাং বলা যায় যে সামাজিক সম্মান ও মর্যাদারক্ষার্থে প্রাপ্ত বয়সের পূর্বেই মেয়েদের শ্বশুরঘরে যেতে হোত। আর তার পরিণাম ছিল অপরিণত বয়সে মাতৃত্ব। গৃহস্থ বাড়ির মেয়েরা তাই বিবাহের পরে প্রবেশ করত শ্বশুরবাড়ির অন্দরমহলে। তাকে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান দিয়ে ভবিষ্যত মাতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করাই ছিল বাড়ির বয়স্ক নারীদের কর্তব্য। সুতরাং বয়:সন্ধির পূর্বেই নারী পুরুষের সম্পর্ক সম্পর্কে তারা অবহিত হয়ে যেত। উনবিংশ শতকের বাংলার সমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণের সহজলভ্যতা ছিল না। তাই সম্পূর্ণ পরিনত হবার পূর্বেই নারী তার দেহের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হবার আভাস পেয়ে যেতেন। বিবাহিত রমনীদের মূল সাংসারিক কর্তব্যই ছিল সন্তানধারণ ও তাদের প্রতিপালন করা। কন্যা সন্তানের থেকে পুত্রসন্তানই অধিক কাঙ্খিত ছিল। 'খোকার মা' শব্দটি সংসারে নারীকে একটি বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করত। তিনি পুত্র সন্তান জন্মদানের গর্বে গর্বিতা হতেন। কৈলাসবাসিনী দেবী 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' গ্রন্থে লিখেছেন যে মহিলারা তাদের স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করেও পুত্র-সন্তান প্রাপ্তির কামনা করে বহু ব্রত-পালন করত। কৈলাসবাসিনী আরও বলেন যে মেয়েরা জগদীশ্বরের কাছে পুত্রসন্তান কামনা করতেন। পুত্র সন্তান জন্মালে ধুমধাম করে জগদীশ্বরের পূজা করা হোত। কিন্তু কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে তেমন কোনো নিয়ম প্রচলিত ছিল না। (Karlekar, 1993) বাংলাদেশে মাতৃত্ব হল একটি আদর্শস্বরূপ। এর মাধ্যমে নারীকে সন্তানের জন্মদান ও তার প্রতিপালন করার মধ্যে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বস্তুত পক্ষে 'খোকার মা' মর্যাদা দানের বিনিময়ে তার মূল সত্তা, স্বকীয়তা প্রভৃতি সবকিছুই হরণ করা হয়েছিল। (Bagchi, 1990)

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে চিকিৎসা সম্মিলনী নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকা্র একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে সাধারণভাবে ১১ বছর বয়সের পূর্বেই মেয়েদের বিবাহ সম্পন্ন হো্ত, ১২ বছর বয়সের মধ্যেই তারা 'মা ষষ্ঠীর' কৃপায় সন্তান সম্ভবা হয়ে যেতেন। পরবর্তী বছরগুলিতে তারা বহু সন্তানের জন্ম দিতেন। অনেক সময় তাদের গর্ভপাতও হয়ে যেত। অনেক ক্ষেত্রে আবার মৃত সন্তান জন্মগ্রহণ করত। ২০ বছর বয়সে যখন তারা পৌঁছতেন ততদিনে তারা অনেক সন্তানের জননী হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর সাথে সাথে শারীরিক কিছু দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি যেমন, প্রসবজনিত জ্বর, পেটের অসুখ শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি দ্বারাও আক্রান্ত হয়ে পড়তেন। (Bose, 2006)

১৩ থেকে ২১ বছর বয়সের মধ্যে নারী মৃত্যুর সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় বেশি ছিল। বিবাহিত জীবনের চরম পর্বে উপস্থিত হয়ে এই মৃত্যু তাদের পরিবার ও সন্তানদের জন্য খুবই বেদনাদায়ক ছিল। যদিও পুরুষেরা একাধিকবার বিবাহ করতে পারতেন তবুও পূর্বতন স্ত্রীর সন্তানেরা পরিবারে অত্যন্ত অবহেলার সাথে প্রতিপালিত হোত। অন্দরমহলে নারীর আবদ্ধতা, বাড়ির ভেতরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপরিণত মাতৃত্ব, একের পর এক সন্তানের জন্মদান, অপুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ, প্রভৃতির কারণে তাদের রক্তাল্পতা, শ্বাসকষ্ট, বিশেষত যক্ষা প্রভৃতি রোগ প্রায়শই হোত। অনেক সময় অসুস্থ সন্তান জন্মগ্রহণ করত এবং অপরিণত বয়স্ক মা তার যথাযথ দেখাশুনা করতে অসমর্থ হোত। এর ফলে শিশু মৃত্যুর হারও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। (Chakraborty, 1963)। শিশুমৃত্যু ও নারীদের মৃত্যুর আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল অপুষ্টি। অপরিণত বয়সে গর্ভবতী হবার দরুন মেয়েরা পুষ্টীকর খাদ্য যেমন মাছ, দুধ, ফল প্রভৃতি খেতে চাইত না। যার ফলে মা ও শিশুর পর্যাপ্ত পুষ্টি হতো না। অপুষ্টির ফলে হয় মায়ের ক্ষতি হতো অথবা শিশুটির পূর্ণ বিকাশ হোত না। (Chakraborty, 1963)।

ঔপনিবেশিক বাংলায় সন্তান প্রসব গৃহের অভ্যন্তরেই হোত। তখনো পাশ্চাত্য চিকিৎসা বাংলার অন্দরমহলে প্রবেশ করেনি। প্রসব প্রক্রিয়াটি যিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন তাকে 'দাইমা' বলা হোত। নিম্নবর্গীয় হিন্দু নারীরা দাইমার কাজ করতেন । প্রসবকালের সকল রকম সমস্যা দেখার দায়িত্ব ছিল তাদের ওপর । তাঁরা সামান্য কিছু আয়ুর্বেদিক ওষুধের কথা জানতেন। এই ওষুধগুলির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও তারা অবগত ছিলেন না। দেশী বৈদ্যদের কাছে প্রসবজনিত কোনো ওষুধের জন্যে যাবার রীতি ছিল না। সুতরাং প্রসব প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে দাইদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোত। এর পশ্চাতে অবশ্য নানাকারণ ছিল। একান্নবর্তী পরিবার হবার দরুন সারা বছর কোনো না কোনো গৃহবধূ অন্তঃসত্তা থাকতেন। তাদের প্রসবের জন্য দাইদের প্রয়োজন ছিল। এই দাইদের সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সহজেই পাওয়া যেত।

যেহেতু ধর্মীয় দিক থেকে প্রসুতি বিষয়টি অশুদ্ধ বলে মনে করা হোত, তাই অন্দরমহলে একটি পৃথক 'সূতিকাগৃহ' থাকত। অন্দরমহলের সবথেকে ব্রাত্য ও অপরিষ্কার জায়গাটি আঁতুড়ঘর রূপে ব্যবহার করা হোত। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীতে বলা হয়েছে যে সুতিকাগৃহগুলি ছিল স্যাঁতসেতে ও অস্বাস্থ্যকর। মা ও সদ্যজাত শিশুর যাতে ঠান্ডা না লাগে বা তাদের কোনো অশুভ শক্তি যাতে আক্রমণ করতে না পারে তার

জন্য সুতিকাগৃহের জানলা ও দরজাগুলিতে বস্তা চাপা দেওয়া হোত। অনেক সময় মাটি দিয়ে জানলাগুলি রুদ্ধ করে দেওয়া হোত। (Forbes, 2005)

শিশু জন্মের পরে দাইরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। মায়ের ও শিশুর নাড়ীকে বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্ব ছিল তাদের উপর। ১৯১১ সালের আদমসুমারীর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে বাঁশের কঞ্চি অথবা শাঁখের ধারালো টুকরো দিয়ে তাদের নাড়ী বিচ্ছিন্ন করা হোত। তারপর ঘুঁটে পুড়িয়ে সেই ভস্ম ওই সদ্য কাটা নাড়ীর ওপর লেপন করা হতো। এর ফলে বহুসুস্থ শিশু ধনুষ্টঙ্কারে মারা যেত। (Engels, 1993) প্রসবের পরে প্রসূতির কাপড় জামা পরিষ্কার করা, গর্ভের ফুলটি দাহ করা প্রভৃতি কাজগুলি দাইরা করত।শিশু জন্মের পর প্রথম ২১ দিন আতুড় থাকত। এই সময় শিশু ও তার মায়ের দেখাশুনা করত দাইরা। শিশুর পরিচর্যা করা, মাকে মালিশ করা, তাদের জামাকাপড় কাচা, মাকে খাবার এনে দেওয়া প্রভৃতি সব কাজই তারা করত। (Mukherjee, 2017)

সমকালীন ব্রিটিশদের লেখনী থেকে বাংলার এই মাতৃত্বকালীন অবস্থার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। Balfour এবং Scottএর বিবরণ থেকে জানা যায় প্রসবের পরে প্রায় দীর্ঘ ১৫ দিন মেয়েদের অশূচী বলে গণ্য করা হোত বলে তাদের স্নান করতে দেয়া হোত না। এই সময় রক্তপাতের কারণে তাদের শরীরে সমস্ত শক্তিক্ষয় হয়ে যেত। শিশু যাতে পর্যাপ্ত দুধ পায় তার জন্য মাকে একটি অপুষ্টিকর খাদ্য খেতে দেওয়া হোত। ভাত ও গোলমরিচের জল বা কখনো বাঁশের কঞ্চি ও আর পয়সা ফুটিয়ে ক্বাথ বানিয়ে খাওয়ানো হোত। আর একটি লেখনীতে Maud Diver মন্তব্য করেছেন যে মায়ের নাড়ী শুকানোর জন্য প্রসবের পরে প্রথম তিনদিন হলুদ, গুড়, নানা উদ্দীপক মশলা মিশিয়ে একটি পানীয় খেতে দেওয়া হোত। সুতরাং এর থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে ঔপনিবেশিক বাংলার গর্ভাবস্থায় ও তারপরে অপুষ্টিজনিত কারণে বহু মেয়ের মৃত্যু হোত। (Goswami, 2011)

এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জন্মগ্রহণ করার ফলে বহু শিশুর মৃত্যু হোত। এই মৃত্যু একটি মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। Sanitary Commission এর ৪৩তম বার্ষিক রিপোর্টে (১৯১০) বলা হয়েছে যে, 'ওই বছর বাংলায় প্রায় ২০,০৭,২২২ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে। তার মধ্যে ৩৮৫,১১২ জন শিশুর জন্মের প্রথম বছরের মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল। তার মধ্যে ২০৫,৯২৫ জন ছিল পুরূষ ও ১৭,৯,১৮৭ জন ছিল নারী। (Goswami, 2011)।

১৮৯৫ সালে Mary Frances Billington তার ভারত সফরের পরে একটি লেখাতে বলেছেন যে দাইদের অজ্ঞতা ও অবহেলার দরুন বহু শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন যে প্রক্রিয়ায় দাইরা প্রসূতি ও তার সন্তানের দেখাশুনা করত, সেটি ছিল অত্যন্ত বর্বরোচিত (Karlekar, 1993)। প্রসূতিদের প্রতি অবহেলার এই চিত্রটি দেশীয় লেককদের লেখনীর দ্বারাও স্পষ্ট জানা যায়। Mary Frances Billington-এর মত বামাসুন্দরী দেবী ও তার "কী কী কুসংস্কার" গ্রন্থে অনুরূপ চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন যে

আমাদের দেশের মেয়েরা তাদের শরীরের যত্ন নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। গর্ভাবস্থায় তারা সেই কাজগুলিই করত, যেগুলো তাদের করা অনুচিত। তাদের যা খুশি তারা খেত। খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করা বা খাদ্যটি গ্রহণ করলে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হবে কিনা সেসব তারা ভেবে দেখত না। তারা অনেক সময় এমন কিছু খাবার খেয়ে ফেলত যা তাদের গর্ভজাত সন্তানের পক্ষে হানিকারক ছিল। বামাসুন্দরী বলেছেন যে অশিক্ষা ও অজ্ঞতার জন্য তারা ক্ষতিগ্রস্থ হতেন। তারা যদি জানতেন যে ওই খাদ্যগুলি তাদের গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি করবে তবে তারা কখনই সেই খাদ্য গ্রহণ করতেন না। (Karlekar, 1993, P-53)। সাহিত্যেও আমরা তৎকালীন সমাজ জীবনের একটা প্রতিচ্ছবি পাই। আশাপূর্ণা দেবীর 'সুবর্ণলতা' গ্রন্থের মূল চরিত্র সুবর্ণলতা নোংরা অস্বাস্থ্যকর আঁতুড়ঘরে সন্তানের জন্ম দিতে অস্বীকার করেছিল। তার এই প্রতিবাদের ফলে সে সংসারে অত্যন্ত সামলোচিত হয়েছিল ('দেবী' ১৩৭৩)।

দেশীয় চিকিৎসকদের মধ্যে মধ্যসূদন দত্ত সর্বপ্রথম প্রসূতি বিভাগের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। তিনি দাইদের প্রশিক্ষনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজ ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগে পুরুষ চিকিৎসকদের প্রসূতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হোত । সাঁড়াশি দিয়ে প্রসব করানোর প্রশিক্ষণ এই বিভাগে শেখানো হোত। এইভাবে প্রসব বেদনা লাঘব করা এবং সুস্থ শিশু ভূমিষ্ট করার কৌশল শেখানো হোত। (Mukherjee 2017) ধীরে ধীরে প্রসূতি বিভাগে রোগিনীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৭৫ – ১৮৮০ সালের মধ্যে এই হাসপাতালে রোগিনীর সংখ্যা ২৭-২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, অন্যান্য হাসপাতাল, যথা - মেয়ো হাসপাতাল, ক্যাম্পবেল হাসপাতাল, হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল, মিউনিসিপাল পুলিস হাসপাতাল প্রভৃতিতে ক্রমশ প্রসূতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এখানে দেশীয় মহিলাদের সংখ্যাই বেশি ছিল। (Mukherjee, 2017).

উনবিংশ শতকের শেষে ব্রিটিশ সরকার এই বিষয়টি সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করেন। এ ব্যাপারে তারা স্থানীয় দাইদের অজ্ঞতাকেই বিশেষ ভাবে দায়ী করেছেন। ধীরে ধীরে ব্রিটিশ সরকার, সমাজ সংস্কারক ভারতীয় চিকিৎসক সকলে মিলে প্রসূতি বিভাগের উন্নয়নে উদ্যোগ নেন। এইভাবে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও দেশীয় পদ্ধতির মাঝে দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে প্রসূতি চিকিৎসা চলতে থাকে। দেশীয় প্রসব পদ্ধতির ত্রুটি লক্ষ্য করে পাশ্চাত্য চিকিৎসকরা আধুনিক প্রসব পদ্ধতির ওপর বেশি জোর দিতে থাকেন। ব্রিটিশ সরকার তখন বাংলায় কথোপকথন করতে পারেন এমন মহিলা চিকিৎসকদের প্রসূতি বিভাগে নিয়োগ করতে শুরু করেন। (Suman, 2011)। এই সব মহিলা চিকিৎসকরা জেনানা মহলে খুব সহজেই সংযোগস্থাপন করতে সমর্থ হয়। প্রসূতিদের মুখে মুখে এই মহিলা চিকিৎসকদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে প্রসূতি বিভাগে রোগীনীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। (Forbes, 2005).

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ব্রিটিশ সরকার প্রসূতি বিভাগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লেডি ডাফরিনের উদ্যোগে Dufferin Fund প্রতিষ্ঠিত হয়, এর দ্বারা সর্বপ্রথম প্রসূতি বিভাগে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শুরু হয়। Dufferin Fund এর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রসূতি বিভাগে পাশ্চাত্য চিকিৎসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারী

নিয়োগ করা। (Lal, 1994). ডাফরিনের এই নতুন প্রসূতি বিভাগে দেশজ প্রথম পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষণহীন দাইদের ওপরে আঘাত হেনেছিল। ডাফরিন এই সমস্ত অজ্ঞ দাইদের 'দায়িত্বজ্ঞান হীন' বলে উল্লেখ করেছেন। (Lal, 1994) ১৯০১-০২ সালে লেডি কার্জন Victoria Memorial Scholarship Fund ঘোষণা করেন। এর দ্বারা মহিলাদের ধাত্রী বিদ্যায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হোত। যাতে তারা দেশীয় দাইদের শিক্ষা দিতে পারে। লেডি মিন্টো ১৯০৭ সালে Indian Nursing Association প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে নার্স বা সেবিকাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হোত। ১৯২০ সালে প্রসূতিদের কল্যাণের জন্য All-India League for Maternity and child welfare প্রতিষ্ঠা করেন।

এইভাবে ব্রিটিশ সরকার স্বাস্থ্য বিভাগের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় অস্বাস্থ্যকর প্রসূতি ব্যবস্থার অবসানের চেষ্টা করেন এবং ভারতীয় নারীদেরও প্রশাসনের অধীনে অনেকাংশে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসার সূত্রপাতের সাথে সাথে যেমন ভারতীয় নারীরা প্রসূতি বিভাগে চিকিৎসা করাতে আসেন, তেমনি অনেক নারী চিকিৎসা বিদ্যা ও ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। ১৮৮০ সালের পরবর্তীকালে কিছু ভারতীয় নারী চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়, যেখন কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, হৈমবতী সেন, অবলা দাস, যামিনী সেন প্রভৃতি যামিনী সেনের জীবনী থেকে জানা যায় যে দেশীয় মহিলারা দেশীয় মহিলা চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাতে পেরে খুব খুশি হতেন, এইভাবে ধীরে ধীরে অন্তঃপূরের পর্দা শিথিল হতে থাকে ও প্রসূতিকেন্দ্রে প্রসূতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই ভাবে পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রসার ও জনপ্রিয়তা জাতীয় আন্দোলনের পথে একটা বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই দীর্ঘ পথ বেয়ে শেষে সুস্থ ও স্বাভাবিক মাতৃত্ব ও প্রসব প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় (Roy, 2015)।

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা বই :

- দেবী, আশাপূর্ণা (১৩৭১), প্রথম প্রতিশ্রুতি, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃ. ১৫৯।
- দেবী, আশাপূর্ণা (১৩৭১), সুবর্ণলতা, কলকাতা মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স পৃ. ৩৯।
- দেবী মহাশ্বেতা, গুপ্ত অজয় সম্পাদিত (২০১১), 'গল্প সঞ্চয়ন', নিউ দিল্লী, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ পৃ. ১১৭।

English Books :

Bagchi, Jashadhara, (October, 20-27, 1990) "Representing Nationalism: Ideology and Motherhood in Colonial Bengal" in *Economical and Political Weekly*, volume -25, Number-42/43, P. WF-65

Bose, Pradip (2006) edited, *Wealth and Society in Bengal: a selection from late19th century Bengali periodicals,* SAGE Publishing India. P. 153-154

Chakraborty, Usha, (1963*), Condition of Bengali Women Around the 2nd half of the 19th century,* Calcutta, Bardhan Press. P.6.

Engels , Dagmar (1993), The politics of child birth : British and Bengali woman in contest, 1890-1930 in Robb, Peter edited, *Society and Ideology : Essays in South Asian History,* New Delhi, Oxford University Press, P.222-246.

Forbes Geraldine (2005), *Women in Colonial India,* New Delhi, Chronicle Books, an Imprint of D.C. Publishers, P.84.

Goswami, Tinni, *Sanitising Society: Public Health and Sanitation in colonial Bengal*, 1880-1947, New Delhi, B.R. Publishing Corporation, P.107-108.

Karlekar, Malavika (1993), *Voices from* within: *Early Personal narratives* of *Bengali Women*, New Delhi, Oxford University Press, P.53-55.

Lal Manisha, (Spring 1994), The Politics of gender and Medicine in colonial India in *Bulletin of the History of Medicine*, John Hopkins University Press, Volume 68, No – 1, P.35.

Mukherjee, Sujata (2017), *Gender*, *Medicine and society in Colonial India*, New Delhi, Oxford University Press (1911), P.71-73.

লেখক পরিচিতিঃ

নূপুর দত্ত (সহ অধ্যাপিকা)

শিশুরাম দাস কলেজ

ফোন : ৮০১৭৭১০৫০৩

Email Dutta : nupurdatta1974@gmail.com